ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 18 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা

অরুণাভ সরকার

ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে সন্ত্রাসী (টেররিস্ট) ও 'মৌলবাদী' হয়ে! মনে মনে এই দৃশ্য দেখতে পেলাম মালেক ভাইয়ের 'সার্জারি'তে গিয়ে। মালেক ভাই (মানে ডাক্তার এস এ মালেক) চিকিৎসক হলেও সার্জন নন। তার সার্জারি হচ্ছে কথ্য ইংরেজির সার্জারি— লোকজন যেখানে গিয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে দেখা করেন।

সেখানে গিয়ে ঐ কথা মনে হলো কি এই জন্য যে, তিনি সন্ত্রাস ও মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক?

না, একেবারেই না। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ করানোর ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল, ছিল শাসনতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রেও। এই নিরপেক্ষতাই তাকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী করেছে। আমি তাকে প্রচলিত প্রথায় আরবিতে অভিবাদন করায় তিনি সংস্কৃত দাবি করলেন।

সংস্কৃত হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের 'ধর্মীয় ভাষা'। তা ব্যবহার করার ঝুঁকি দুটো— সাংস্কৃতিক সংহতির ক্ষতি সাধন এবং সংখ্যালঘু হিসেবে বিড়ম্বনা ভোগ। সন্ত্রাসী আর মৌলবাদীদের তো তা-ই কাম্য। তারা চায় সংখ্যালঘুরা নিপাত যাক, যাক দেশান্তরে, তাদের ভিটেমাটি হাতে আসুক।

সন্ত্রাস আর মৌলবাদ শব্দের অর্থই অবশ্য পাল্টে গেছে।

আভিধানিক অর্থে সন্ত্রাস হচ্ছে 'অতিশয় ভয়'। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কালের সন্ত্রাসবাদ ছিল 'টেররিজম' শব্দের সমার্থক'। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকে। তখন তা ছিলও— স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা নিজেদের স্বার্থে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের মাধ্যমে দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করতে থাকে। রুখে দাঁড়ান ছাত্র ইউনিয়ন আর ছাত্রলীগ। এই অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিচু ক্লাসের ছাত্ররাও যোগ দিয়েছিলেন। পরে মুক্তিযুদ্ধে তারা অস্ত্র হাতে নেন।

স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু অস্ত্র সমর্পণের আহবান জানিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই সে ডাকে সাড়া দেন। কেউ কেউ তা উপেক্ষা করে পরাজিত অপশক্তি, ধড়িবাজ রাজনীতিক এবং নানা শ্রেণীর উগ্রপন্থীদের প্ররোচনায়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ঘটে আরো দুঃখজনক ঘটনা। সরকারি-বেসরকারি, দেশী-বিদেশী নানা সূত্রে ছাত্রদের হাতে আবার অস্ত্র আসতে থাকে। তারা প্রশ্রয় পেতে থাকে, পেতে থাকে প্রশিক্ষণ আর পারিতোষিক। তারা জেনে যায়, 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস।' দেশপ্রেমিক বলে বিবেচিতরাও তখন অস্ত্রবাজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শুরু হয় ব্যক্তি স্বার্থে হানাহানি। স্কুলের ছাত্ররাও এখন এই ছিন্নমস্তা খেলায় মত্ত।

সন্ত্রাসবাদ এখন সাধারণ মানুষের ঘৃণার বিষয়, অতিশয় ভয়ের বিষয়।

মৌলবাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। কথাটা 'ফানডামেনটালিজম'-এর প্রতিশব্দ। সে অর্থের মৌলবাদীরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাদের ধর্মগ্রন্থের সব কথাই আক্ষরিক অর্থে সত্য।

সরল মনে কেউ এমন ভ্রান্তি-বিলাসী হলে অন্যের খুব ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। কোনো ধর্মই তো মানববিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক বৈরিতা অনুমোদন করে না। ধরা যাক, ইসলামের কথা। প্রকৃত বিশ্বাসীকে অবশ্যই শান্তিপ্রিয়, উদার এবং আধুনিক হতে হবে। তার প্রার্থনা তো সেই কোমলতার জন্য তার উপাস্য যার আধার। তিনি এই বিধানও জানবেন যে, 'স্বর্গীয় দান' থেকে অবিশ্বাসীকেও বঞ্চিত করা যাবে না। আর যুগোপযোগী শিক্ষা? সে জন্য প্রয়োজনে দুর্গম দেশেও যেতে হবে।

মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তা সত্য। তাদের অনেকের ধর্মীয় আবেগ যে প্রবল, সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু আরো বড়ো সত্য, সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নন, উগ্রপন্থী নন। উগ্রপন্থীরাই তবু প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে? কোথায় তাদের শক্তির উৎস?

এখন যারা মৌলবাদী বলে পরিচিত, তারা তেমন নয়। তারা শিক্ষা-বিমুখ, প্রগতিবিরোধী, স্বার্থপর, অশান্তিপ্রিয় এবং পরধর্মের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। এসব প্রবণতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী আর ক্ষমতালোভীরা। এখন মৌলবাদী মানে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ধর্মীয় উগ্রপন্থী।

এদের বড়ো সাফল্য এই যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এরা এদের কুচিন্তার বীজ ছড়াতে পেরেছে।

স্কুলে এখন ধর্ম এবং 'ধর্মীয় ভাষা' অবশ্য পাঠ্য। এই বিধান গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। আইনে শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেক গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। যে মূলনীতি বা 'স্পিরিট' (spirit)-এর ভিত্তিতে এই আইন, তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

তা হয়নি। পড়ুয়াদের পারিবারিক ধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে এক বিভেদমূলক পাঠক্রম। পাশাপাশি বসে যে দুজন পড়ুয়া বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ নেয়, 'ধর্মীয়' পাঠের জন্য তাদের যেতে হয় আলাদা আলাদা ঘরে। তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তারা অভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের সন্তান নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্তান।

ধর্মীয় পাঠ পৃথক পৃথক; কিন্তু তা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা সমান্তরাল নয়। অনেক স্কুলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় পাঠদানের ব্যবস্থাই নেই। সঙ্গত কারণে তা হয়তো সম্ভবও নয়। অথচ বিষয়টা আবশ্যিক (কমপালসরি)! কোনো কোনো স্কুলের পরিস্থিতি আরো অবাক করা। এসব স্কুলে ক্লাস শুরুর আগে এক অভিন্ন প্রার্থনা সঙ্গীতে কণ্ঠদান প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে গান ধর্মনিরপেক্ষ গান নয়।

এই রীতি সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের অঙ্গীকারকেও ক্ষুণ্ন করছে।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই অবস্থার অবসান দাবি করেছেন। 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' গ্রন্থের ভূমিকায় সমিতির তৎকালীন (১৯৯৬) সভাপতি ম. আখতারুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান উল্লেখ করেছেন যে, তাদের প্রথম এবং প্রধান দাবি হচ্ছে, 'একটি আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, জনকল্যাণমুখী শিক্ষানীতি।'

সম্প্রতি প্রায় একই দাবি জানানো হয়েছে বাংলাদেশ নীতি নিরীক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত এক সেমিনারে। বক্তারা সবাই স্বনামধন্য ব্যক্তি— বদরুদ্দীন উমর, আ ফ ম মাহবুবুল হক, ম. নূরুন্নবী এবং ডক্টর মোফাজ্জেলুল হক। তারা সরকারি ব্যয়ে ধর্মশিক্ষা দান বন্ধ করার দাবি জানান। তারা বলেন, শিক্ষানীতি হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, ইহজাগতিক এবং একমুখী। পাঠক্রম থেকে অদৃষ্টবাদ এবং সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা পরিহারের ব্যাপারেও তারা গুরুত্ব দেন।

আলোচকরা 'আওয়ামী বুদ্ধিজীবী' নন। তবু তারা বঙ্গবন্ধুর কথার প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তবসম্মত, অসাম্প্রদায়িক (কিন্তু ধর্মবিরোধী নয়) শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে 'খুদা কমিশন' গঠন করেছিলেন। কমিশন তার প্রস্তাব পেশ করেন ১৯৭৪ সালে। ব্যস।

প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমান সরকার সেই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করছেন না কেন?

উত্তর পাওয়া যেতে পারে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে (১৯৯৮)। এতে বলা হয়েছে, 'সরকার ধর্মনিরপেক্ষ; কিন্তু (দেশের) রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রবল। (কাজেই) সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে সরকার স্পর্শকাতর।'

মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তা সত্য। তাদের অনেকের ধর্মীয় আবেগ যে প্রবল, সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু আরো বড়ো সত্য, সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নন, উগ্রপন্থী নন। উগ্রপন্থীরাই তবু প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে? কোথায় তাদের শক্তির উৎস?

বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অঙ্গহানি ঘটায়। সে দেশ এই দেশের স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি। তাদের সঙ্গে আগেই হাত মিলিয়েছিল আরো কিছু ধর্মব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসবাদী দেশ। প্রতিবেশী দেশটিতে এখন ক্ষমতাসীন যে মৌলবাদী চক্র, তাদের ভূমিকাও অভিন্ন হওয়ার কথা নয়। মৌলবাদীরা এ দেশে ক্ষমতায় এলে ওদের লাভ, আরো লাভ রাজনৈতিক গোলযোগে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি হলে।

বিদেশী অপশক্তির বর্ণচোরা ক্রীড়নকরা সেই চেষ্টাই করছে। এই তপস্বী বিড়ালদের গলায় ঘন্টা বাঁধা দরকার, এখনই, ঐক্যবদ্ধভাবে।

অরুণাভ সরকার : কবি, সাংবাদিক, লেখক।